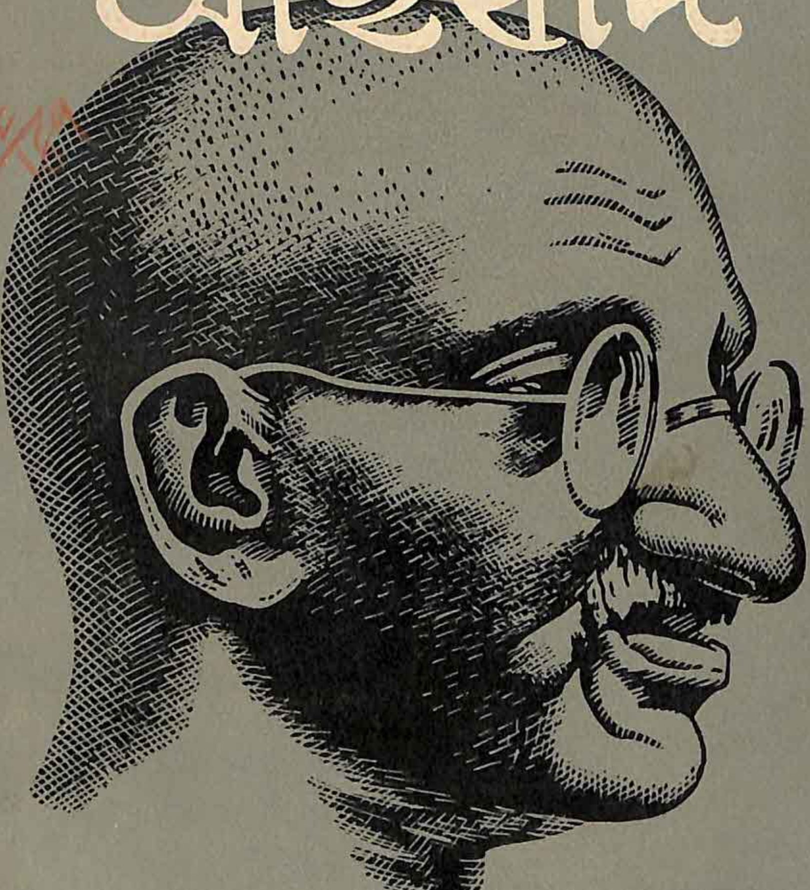
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অহিংসবাদ



গান্ধী স্মারক নিধি

বাংলা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অহিংসবাদ

সাধনা সোম অনূদিত

পরিবেশক
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১৪, রিভারসাইড রোড
বারাকপুর (২৪-পরগনা)

কলিকাতা কেন্দ্র :
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭০ (ডিসেম্বর ১৯৬৩)
মুদ্রণ-সংখ্যা : ৩১০০

মূল্য : ০·৬২ ন. প.

মুদ্রক : শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

Achhibad is the Bengali translation of Gandhiji's book 'Trusteeship' published by the Navajivan Trust of Ahmedabad. It contains in brief the basic principles of the theory of trusteeship as envisaged and preached by the Mahatma in his desire to obliterate class distinctions and establish economic equality in society.

Published by the permission of the Navajivan Trust.

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

মহাত্মা গান্ধী	৬·৫০
সর্বোদয়	২·৫০
গীতাবোধ	১·৫০
নারী ও সামাজিক অবিচার	৪·০০
পল্লী-পুনর্গঠন	৩·০০
সত্যই ভগবান	৩·৫০
পঞ্চায়েত রাজ	০·৭৫
কর্মের সন্ধান	০·৭৫
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ	২·৫০

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম

আমি বলতে চাই এক হিসাবে আমরা চোর। আশু প্রয়োজনে লাগবে না অথচ সঞ্চয় করে রেখে দিলাম,—তা হলে অন্যের কাছ থেকে চুরি করা হল। আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাবার জন্য প্রকৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে থাকেন। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট মাত্র নেন, তার চেয়ে বেশী নয়, তা হলে পৃথিবীতে কোন রকম অভাব অনটন থাকবে না—পৃথিবীতে কোন মানুষই উপবাসে মরবে না। আমি সাহসের সঙ্গে বলতে চাই, প্রকৃতির এই মৌলিক নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই অসমতা বর্তমান, ততদিন পর্যন্ত আমরা চুরিই করছি বলতে হবে।

আমি সমাজবাদী নই। যাদের সম্পত্তি আছে আমি তাদের সে অধিকার থেকে বিচ্যুত করতে চাই না। কিন্তু, অবশ্য বলব, ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের মধ্যে যাঁরা অন্ধকারে আলো দেখতে চান এ নিয়ম তাঁদের অনুসরণ করতেই হবে। কাউকেই অধিকার বিচ্যুত করতে আমি চাই না। তা হলে অহিংস বিধি থেকে দূরে সরে পড়া হবে। যদি কারও সম্পত্তি আমার চেয়ে বেশী থাকে তো থাক। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনকে

নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বলতে চাই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবার সাহস আমার নেই। দিনে একবার আহার জোটে এরূপ তিরিশ লক্ষ লোক আছে ভারতবর্ষে। সে আহারও স্নেহজাতীয় পদার্থহীন শুধু একখানা চাপাটি আর এক ফোঁটা নুন। এই তিরিশ লক্ষ লোক যতদিন পর্যন্ত ভালভাবে খেতে পরতে না পারে ততদিন পর্যন্ত যে সম্পত্তি বাস্তবিক আছে তা ভোগ করবার অধিকার আমাদের কারো নেই। আমাদের মত জ্ঞান সম্পন্ন লোকের পক্ষে নিজেদের চাহিদাকে মানিয়ে নেওয়া একান্ত দরকার। এমনকি ওদের সেবা, খাওয়া ও পরার জন্য ইচ্ছাকৃত উপবাস করাও আমাদের দরকার।

[গান্ধীজীর বক্তৃতা ও লেখা—৪র্থ সংস্করণ]

ত্যাগ করে ভোগ কর

আজকের দিনে নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে ধনীদের বিশেষ রূপে বিবেচনা করে দেখা দরকার। নিজেদের সম্পত্তি পাহারা দেবার জন্য যাঁরা বেতনভোগী ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করেন তাঁরা দেখতে পাবেন, সেই সব তত্ত্বাবধায়কেরাই বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি করে সশস্ত্রভাবে বা অহিংসা অস্ত্রে লড়াই করতে হয় অর্থশালী শ্রেণীদের তা শিখতে হবে। যাঁরা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করতে চান, তাঁদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও কার্যকরী মন্ত্র 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগ করে ভোগ কর।

এর বিশদ অর্থ এই যে—"কোটি টাকা না হয় উপার্জন করলে, কিন্তু মনে রেখো তোমার ধন তোমার নয়। জনসাধারণের। তোমার বৈধ প্রয়োজনের জন্য যেটুকু দরকার, নাও। বাকীটুকু নিয়োগ কর সমাজের জন্য।" এ সত্য আজ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কিন্তু এই দুর্দিনেও যদি ধনিক শ্রেণী তা পালন না করেন তা হলে তাঁরা নিজেদের ধন সম্পত্তি ও কামনার দাস হয়ে তাঁদের উপর প্রভাববিস্তারকারীদেরই দাসে পরিণত হবেন।

ধনহীনের দ্বারা শাসনের দিন আসছে, দেখতে পাচ্ছি। সেই শাসন অস্ত্রবলের দ্বারা অথবা অহিংসার পথে হতে পারে। দেহের মত শারীরিক বলও অনিত্য—এ কথা যেন আমরা মনে রাখি। কিন্তু আত্মার শক্তি চিরন্তন। এমনকি আত্মার মতই শাশ্বত।

[হরিজন, ১-২-'৪২]

অনুমতি ছাড়া অন্যের কাছ থেকে কিছু নেওয়া অবশ্যই চৌর্যবৃত্তি। নির্দেশিত কাজে ব্যয় না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় বা নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজে লাগানোও চৌর্যবৃত্তি। যে গভীর সত্যের উপর এই দর্শনের ভিত্তি তা হল,—উপস্থিত প্রয়োজনের জন্য যেটুকু দরকার ঈশ্বর তার অতিরিক্ত কিছুই সৃষ্টি করেন না। সুতরাং যেটুকু না হলে নয় তার বেশী যিনিই আত্মসাৎ করুন, তিনিই চুরির অপরাধে অপরাধী।

[আশ্রম নিয়মাবলীর প্রতিপালন, ১৯৫৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়

অছিবাদ তত্ত্ব

মনে করা যাক, বেশ কিছু সম্পদের অধিকারী হলাম এবং তা পেলাম উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমার জানা একান্ত প্রয়োজন, এ সমস্ত সম্পদের মালিক আমি নিজে নই। সম্মানিত জীবনযাত্রার অধিকারই মাত্র আমার। অন্যান্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে জীবন যাপন করে তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। আমার সম্পদের বাকী অংশ লোকসমাজের কল্যাণের জন্যই ব্যয়িত হওয়া একান্ত দরকার। এ তত্ত্ব আমি তখনই প্রকাশ করি, যখন জমিদার এবং দেশীয় রাজাদের সম্পত্তি সম্পর্কে দেশের সামনে সমাজবাদ তত্ত্ব রাখা হল। বিশেষ সুবিধাভোগী এ সব সম্প্রদায়ের অবসান চায় লোক। আমি চাই লোভ এবং অধিকারের ধারণা থেকে তাঁরা বিমুক্ত হোন এবং ধন থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জনকারীদের সমপর্যায়ে নেমে আসুন। শ্রমজীবীদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সে তার শ্রমের যতটা মালিক, ধনিক তার ধনের ততটা মালিক নয়। পরন্তু শ্রমজীবীরা তাদের নিজেদের অর্থাৎ তাদের কার্যক্ষমতার মালিক।

এ সংজ্ঞা অনুসারে কত জন যে প্রকৃত অছি হতে পারবেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যদি এ তত্ত্ব সত্য হয় তা হলে অনেকে এ ভাবে চলেন কি মাত্র একজন চলেন সে কথা

অকিঞ্চিৎকর। আসল কথা হল দৃঢ় বিশ্বাস। যদি অহিংসা-নীতি গ্রহণীয় হয় তা হলে সে ভাবেই জীবন যাপন করার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে। সফলতা বা বিফলতার কথা ভাবলে চলবে না। বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, এমন কোন কিছু নেই এ তত্ত্বে। অবশ্য একে কার্যে পরিণত করা বড় কঠিন, সে কথা বলতে পার।

[হরিজন, ৩-৬-'৩৯]

সাংবিধানিক অছিবাদ

"আপনি ধনীদের অছি হবার কথা বলেছেন। এর অর্থ কি এই যে, তাঁরা নিজেদের সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করে তার জন্য অছি সৃষ্টি করবে? এবং এই অছি আইনের চোখে বৈধ এবং গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হবে? বর্তমানে যার উপর ভার ন্যস্ত হল তার মৃত্যুর পর কি ভাবে উত্তরাধিকারী নির্ধারিত হবে?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, কয়েক বছর আগে এ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন, এখনো তাঁর সেই মত। অর্থাৎ সব কিছুই ঈশ্বরের এবং সব কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। অতএব তাঁরই সৃষ্ট মানুষের সামগ্রিক ভাবে তা প্রাপ্য, কোন বিশেষ ব্যক্তির নয়। যখন প্রাপ্য অংশের চেয়ে কোন ব্যক্তির বেশী থাকে, তিনি তখন সেই অংশের অছি হন ঈশ্বরের মানুষদের জন্য।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিনিয়ত তিনি সৃষ্টি করেন। সুতরাং তত্ত্বতঃ মানুষও নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে বাঁচবে এবং জিনিসপত্র মজুত করে রাখবে না। যদি জনসাধারণ সহজভাবে এ সত্য মনে মনে গ্রহণ করত তা হলে এ আইনসঙ্গত হত এবং অছিবাদও একটি আইন-সম্মত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হত। ভারতবর্ষের কাছ থেকে পৃথিবী এই অছিবাদ উপহার নিক— এই-ই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তা হলে আর কোন শোষণ থাকবে না এবং অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশগুলি শ্বেতকায়দের এবং তাদের ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য আর সংরক্ষিত থাকবে না। এই যে পার্থক্য, তারই মধ্যে রয়েছে গত দুই মহাযুদ্ধের চেয়েও অত্যন্ত তীব্র যুদ্ধবীজ। উত্তরাধিকারীর কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বর্তমান অছিরই ক্ষমতা থাকবে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার। অবশ্য আইনানুগ অনুমোদন নিয়ে।

[হরিজন, ২৩-২-'৪৭]

শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা নিজেদের সম্পদের অছি হিসাবে নিজেদের স্বেচ্ছা-পরিবর্তন—এই দুইয়ের মধ্যে পথ বাছাই করে নিতে হবে সম্পদের বর্তমান মালিকদের। সম্পত্তি পরিচালনার ভার তাদের হাতে রাখবার জন্য এবং প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করার অনুমতি দেওয়া হবে। তাদের নিজের জন্য নয়, জাতির কাজে—অতএব তা হবে শোষণহীন। নিয়োগের হার (পারিশ্রমিক) ঠিক করে দেবে রাষ্ট্র। তাঁদের সেবা এবং

সমাজে তার মূল্যের সহিত সমতা রক্ষা করে তাঁরা পারিশ্রমিক পাবেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা যদি যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন তা হলে সম্পত্তি পরিচালনের ভার পাবেন।

ধরা যাক আগামীকাল ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন দেশ হল। তখন বিত্তবানেরা আইনানুগ অছি হবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এরূপ আইন উপর থেকে চাপানো হবে না। নীচু থেকেই তা আসবে। অছিবাদ প্রবর্তনের অর্থ যখন জনগণ বুঝতে পারবে এবং আবহাওয়া যখন সম্পূর্ণ অনুকূলে আসবে, তখন তারা নিজেরাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে এ ধরনের আইন বা সংবিধান প্রবর্তন করবেন। নিচু থেকে আসা এ জিনিস গ্রহণ করা সহজ। উপর থেকে এলে ভারী বোঝা স্বরূপ হওয়ার সম্ভাবনা।

[হরিজন, ৩১-৩-'৪৬]

তৃতীয় অধ্যায়

ধনীর সমস্যা

[আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পিয়ারে সেরেসোল ১৯৩৫ সালে ভারত ভ্রমণের সময় গান্ধীজীর সামনে ধনতন্ত্র এবং অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর কিছু কিছু সন্দেহের অভিব্যক্তি দেন প্রশ্নের মারফতে। যেমন :—]

"বিত্তশালীর জন্য জীবন ধারণ সম্বন্ধীয় কোন কানুন কেউ তৈরী করতে পারে কি? অর্থাৎ কি পরিমাণ তার থাকবে বা থাকবে না কেউ তা নির্দেশ করতে পারে কি?"

গান্ধীজী হেসে বললেন, "হ্যাঁ, পারে। ধনীরা ধনের শতকরা ৫ ভাগ অথবা ১০ ভাগ বা ১৫ ভাগ নিক।"

"কিন্তু শতকরা ৮৫ ভাগ নয় কেন?"

"রক্ষা কর! শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত যেতে পারার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু ৮৫ ভাগ নেবার কথা এমনকি একজন শোষকেরও না ভাবা একান্ত উচিত।"

ধনীকে বুঝিয়ে রাজী করবার জন্য মানুষ কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এ কথা পরিষ্কার ভাবে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না পিয়ারে সেরেসোল।

গান্ধীজী বললেন, "সেখানেই কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার মতে চরম মানদণ্ড বা মাপকাঠি হল অহিংসা। আমরাও একদিন ধনীর সমপর্যায়ে ছিলাম এ কথা মনে রাখতে হবে। এ পরিবর্তন আমাদেরও সহজে হয়নি। যেমন আমরা নিজেদের বরদাস্ত করেছি, তেমন অন্যদেরও বরদাস্ত করা উচিত। তা ছাড়া, সে ভ্রান্ত আর আমি অভ্রান্ত—এরূপ ভাবার অধিকার আমার নেই। তাকে আমার মতে আনতে না পারা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। ইতোমধ্যে সে যদি বলে 'আমি আমার জন্য শতকরা ২৫ ভাগ রাখতে এবং ৭৫ ভাগ লোকসেবার কাজে দিতে রাজী আছি।' তা হলে তার কথাই

মেনে নেব। কারণ বেয়নেটের মুখে ১০০ ভাগ সমর্পণ করার চেয়ে স্বেচ্ছাকৃত শতকরা ৭৫ ভাগ দান অনেক ভাল। এ ভাবে শতকরা ৭৫ ভাগ নিয়ে খুশী মনে সীজারকে সীজারের প্রাপ্য দিচ্ছি, এ আমি জানি। আমাদের দুইয়ের মাঝে অহিংসাই হবে মিলনক্ষেত্র।

"তুমি তর্ক করতে পার, আজ বাধ্য হয়ে যে লোক আত্ম-সমর্পণ করছে, আগামীকাল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই সে তা মেনে নেবে। আমার মনে হয় সে সম্ভাবনা বহুদূর। তাকে ভিত্তি করে সৌধ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। এ কথা অতি সুনিশ্চিত যে, যদি আজ হিংসার প্রয়োগ করি তা হলে নিঃসন্দেহে আমাকে আরও তীব্র হিংসার মুখোমুখী হতে হবে। অহিংসার ধর্ম অনুযায়ী জীবন হবে বোঝাপড়ার সমষ্টি। এর অন্যথা নেই। কিন্তু সীমাহীন বিরোধিতার সমষ্টি থেকে এ অনেক ভাল।"

"ধনীর বৈধ অবস্থা এক কথায় কেমন করে বোঝাবেন?"

"এক কথায় তা হল ট্রাস্টি বা অছি। আমি কিছু সংখ্যক বন্ধুকে জানি যাঁরা আয় করেন এবং গরীবদের জন্য ব্যয় করেন এবং সম্পত্তির অছি ছাড়া নিজেদের আর কিছু ভাবেন না।"

"আমারও কিছু সংখ্যক ধনী এবং দরিদ্র বন্ধু আছেন। আমার নিজের ধন নেই কিন্তু ধনী বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করি। নিজেকে কি ভাবে সমর্থন করব?"

"ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য আপনি কিছুই গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ বায়ু পরিবর্তনে সুইট্জারল্যাণ্ড যাবার জন্য টাকার

চেক্ গ্রহণ না করে আপনি হরিজনদের জন্য কূপ খনন কাজে অথবা তাদের জন্য বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা নির্মাণহেতু লাখ টাকা গ্রহণ করবেন। নিজের সমস্ত অহংকে মুছে ফেললেই সকল সমস্যা সহজ হয়ে যাবে।

"কিন্তু আমার নিজের খরচপাতি সম্বন্ধে কী হবে?"

"একজন শ্রমিককে তার যোগ্যতা হিসাবেই মজুরী দেওয়া হয়। আপনাকে এ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবেন না। আমাদের মধ্যে সকলেই সেই একই জিনিস করছে। অধ্যাপক ভাঁসালীর পারিশ্রমিক কেবলমাত্র আটা ও নিমপাতা। আমরা সকলেই ভাঁসালী হতে পারি না। কিন্তু আমাদের জীবনকে তাঁরই কাছাকাছি নেবার চেষ্টা করতে পারি। এ ভাবে আমি আমার জীবিকা পেলে সন্তুষ্ট থাকব, কিন্তু কোন ধনী ব্যক্তিকে বলব না আমার ছেলের একটা ব্যবস্থা করতে। আমার একমাত্র লক্ষ্য রাখবার বিষয় হল যতদিন সমাজকে সেবা করব ততদিন পর্যন্ত দেহ ও আত্মা দুইকেই রক্ষা করা।"

"কিন্তু যতদিন আমি তাঁর কাছ থেকে ভাতা নেব ততদিন পর্যন্ত তাঁকে অবিরত স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার উচিত নয় কি যে, তাঁর পদকে হিংসা করার কিছু নেই? শুধু মাত্র জীবন যাপন করার জন্য যা দরকারী নয় তিনি যেন তার মালিক না হন—এ কথা তাঁকে বলা কি আমার কর্তব্য নয়?"

"নিশ্চয়ই। সেটা আপনার কর্তব্য।"

"কিন্তু ধনীদের মধ্যেও তফাৎ আছে। কিছু সংখ্যক আছেন যাঁরা ধন স্তূপ করেছেন মদের ব্যবসা করে।"

"হ্যাঁ, একটা সীমারেখা নিশ্চয়ই আপনাকে স্থির করতে হবে। শুঁড়ীর কাছ থেকে আপনি অর্থ গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যদি কোন কাজে অর্থ দানের জন্য আবেদন করেন তখন কি করবেন তা বলতে পারছি না। জনসাধারণকে কি এ কথা বলবেন যে কেবলমাত্র যাঁরা সদুপায়ে অর্থোপার্জন করেছেন শুধু তাঁরাই টাকা দেবেন? ওই রকম সর্তে টাকা আশা করার পরিবর্তে আমি বরং এই আবেদন তুলে নেব। কোন লোক সাধু কি সাধু নয়, সেটা ঠিক করবে কে? সততা একটি আপেক্ষিক শব্দ। যদি নিজেদেরই প্রশ্ন করি, দেখব সারা জীবন আমাদের সততার মধ্যে কাটেনি। বস্তুতঃ গীতায় আছে—'আমরা প্রত্যেকে একই কলঙ্কে মলিন।' সেজন্য অন্যকে বিচার করার চেয়ে যে জগৎ শুচি এবং অসাধুতা দ্বারা প্রভাবিত নয়, সে জগতে বাস কর। অহং বর্জনই এর রহস্য।"

"আচ্ছা! বুঝেছি।" বলে পিয়ারে সোল কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে রইলেন। তার পর একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু মানুষ কখনো কখনো অস্বস্তিকর বা জটিল অবস্থার সামনে এসে পড়ে। কয়েক আনা, এমনকি কখনো কখনো এক আনার চেয়েও কমে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোককে আমি খাটতে দেখেছি বিহারে। তাদের আশেপাশে যে সকল ধনী আছে

তাদের অসৎ উপায়ে উপার্জিত ধন থেকে অধিকারচ্যুত করতে চায়,—এ কথা প্রায়ই আমাকে বলে। আপনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি তাদের সামনে নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি।”

[হরিজন, ১-৬-'৩৫]

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধন

প্রশ্ন ॥ সৎপথে কি করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করা সম্ভব? ব্যবসায়ী শিরোমণি যমুনালালজী বলতেন, তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, যতই সাবধান হোন না কেন, একজন ধনী বাস্তবিক প্রয়োজনের অনেক বেশী নিজের জন্যে ব্যয় করতে বাধ্য হন। সুতরাং সম্পদের অছি হওয়ার বদলে ধনী না হওয়ার দিকেই কেন বেশী জোর দেওয়া হবে না?

উত্তর ॥ প্রশ্নটি যথার্থ। এ প্রশ্ন আমার কাছে আগেও এসেছে। যমুনালালজী যা বুঝতে চেয়েছেন, গীতার সূত্রমতে তা হল—প্রতি কর্মই দোষদুষ্ট। আমার বিশ্বাস, জেনে শুনে অন্যায় না করে ধন উপার্জন সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, আমি আমার এক একর জমির উপর সোনার খনি আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করি যে ধন উপার্জন করে এর অছি হওয়ার চেয়ে ধন কামনা না করা ভাল। আমি নিজের ধনসম্পদ্ ত্যাগ করেছি অনেকদিন। অন্যদেরও তাই করতে বলি। কিন্তু যাঁরা পূর্বেই ধনবান হয়েছেন এবং যাঁরা ধনের

আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন, তাঁদের আমি কী উপদেশ দিতে পারি ? তাঁদের মাত্র এ কথা বলতে পারি যে, তাঁরা তাঁদের অর্থ সেবাকার্যে ব্যবহার করবেন। এ কথা সত্য যে সাধারণতঃ ধনীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করেন নিজের জন্য। কিন্তু একে এড়িয়ে চলা যায়। যমুনালালজী তাঁর সমসঙ্গতিসম্পন্ন এমনকি অনেক মধ্যবিত্ত লোকের চেয়েও নিজের জন্য কম খরচ করতেন। আমি অসংখ্য ধনী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি যাঁরা নিজেদের বেলায় কৃপণ। কারো কারো মধ্যে নিজেদের জন্য কিছুই ব্যয় না করা স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেটা যে তাঁদের গুণ সে সম্বন্ধেও ভাবেন না।

অর্থশালী ব্যক্তির সন্তানদের সম্বন্ধেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। আমার ব্যক্তিগত মত হল,—ধনের উত্তরাধিকারে অবিশ্বাস। বিত্তবান ব্যক্তিগণ তাঁদের সন্তানদের এমন ভাবে পালন ও শিক্ষিত করবেন যাতে তারা স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা পায়। তাঁরা তা করেন না—এইটেই সবচেয়ে দুঃখকর। তাঁদের সন্ততিরা কিছু পরিমাণ শিক্ষা পায়, এমনকি তারা দারিদ্র্য সম্বন্ধে প্রশস্তি কবিতা আবৃত্তি করে, কিন্তু পিতৃদত্ত অর্থের মারফতে নিজেদের পোষণ করায় বিবেকের দংশন অনুভব করে না। সে হেতু আমি নিজের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ করি এবং যা কার্যকরী করা সম্ভব সে সম্বন্ধেই শুধু উপদেশ দিই। অবশ্য আমাদের মধ্যে যাঁরা দারিদ্র্য বরণ করাকে কর্তব্য জ্ঞান এবং বিশ্বাস করেন ও ধনসাম্য কামনা করেন, ধনীদের প্রতি তাঁদের

যেন হিংসা না থাকে। আমাদের দারিদ্র্যের মধ্যে যে প্রকৃত সুখ রয়েছে, যা পাবার জন্য অন্যেরাও প্রতিযোগিতা করতে পারেন,—সেটাই তাঁরা প্রদর্শন করবেন। কিন্তু বেদনার কথা, যাঁরা এভাবে সুখী তাঁদের সংখ্যা অতি কম এবং তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

[হরিজন, ৮-৩-'৪২]

চতুর্থ অধ্যায়

ধনকে অপবিত্র হতেই হবে এমন নয়

শ্রীশঙ্কর রাও দেও লিখেছেন ঃ—

"হরিজনের সর্বশেষ সংখ্যায় আপনার 'একটি শোচনীয় ঘটনা' প্রবন্ধে ধনীদের বলেছেন ঃ "কোটি টাকা উপার্জন করতে হয় করুন। কিন্তু মনে রাখবেন যে সে অর্থ আপনার নিজের নয়, জনতার। নিজের বৈধ প্রয়োজনে যা দরকার তা নিন এবং বাকীটুকু সমাজের জন্য ব্যবহার করুন।" যখন পড়লাম, প্রথম প্রশ্ন আমার মনে এল— —কেন প্রথমে কোটি টাকা উপার্জন এবং পরে সমাজের জন্য তা ব্যয়? বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোটি টাকা উপার্জনের উপায়গুলি অপবিত্র হতে বাধ্য। যিনি অসৎ উপায়ে কোটি টাকা উপার্জন করেন তার কাছ থেকে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এ মন্ত্র আশা করা যায় না। কারণ অসৎ উপায়ে কোটি টাকা রোজগারের পন্থাই সে মানুষের চরিত্রকে সংক্রমিত অথবা দূষিত করতে বাধ্য। তার উপর আপনি সব সময়েই উপায়ের পবিত্রতার উপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, জনসাধারণ আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। আপনি উপায়ের চেয়ে শেষ ফলের দিকেই বেশী জোর দিচ্ছেন এ কথা তাদের মনে আসতে পারে।

"আপনাকে অনুরোধ করছি, অর্থ উপার্জনের পথ ব্যয়ের পথের তুলনায় বেশী পবিত্র না হলেও সমান পবিত্র হবে এ কথার উপর জোর দিন। যদি সৎ পন্থা কঠোর ভাবে পালন করা হয় তা হলে আমার ধারণা, কোটি টাকা কোনক্রমেই একত্রীভূত হতে পারবে না এবং সমাজের জন্য ব্যয় করার অসুবিধা খুব নগণ্য আকার ধারণ করবে।"

—উপরের মন্তব্যের সঙ্গে আমি মোটেই একমত নই। নিশ্চয়ই অতিশয় সৎ উপায়ে একজন কোটি টাকা উপার্জন করতে পারে। অবশ্য একজনের পক্ষে ধনসম্পত্তির মালিক হওয়া বৈধ, এ ধরে নিয়ে এ কথা বলছি। যুক্তির খাতিরে মেনে নিলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা অপবিত্র নয়। অসৎ উপায় অবলম্বনের অপরাধ না করেও হঠাৎ কোটিপতি হওয়া যায় যদি কেউ একটি খনির ইজারা পায় এবং তাতে একটি অমূল্য হীরা পেয়ে বসে। কোহিনুরের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান কুল্লিনান হীরা এরূপ ভাবে পাওয়া গিয়েছিল। এ রকম দৃষ্টান্ত সহজে আরও দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করেই ছিল আমার যুক্তি। সাধারণতঃ ধনী লোক, এমনকি অধিকাংশ লোক কি ভাবে টাকা উপার্জন করেছে সে বিষয়ে তারা সজাগ নয়—এ কথা মেনে নিতে কোন দ্বিধা নেই। অহিংস প্রণালী প্রয়োগের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখতেই হবে যে, মানুষ যতই শয়তান বা নীতিভ্রষ্ট হোক না কেন, তাকে দয়ালু এবং নিপুণ ব্যবহারের দ্বারা শোধরানো সম্ভব। মানুষের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে তার প্রতি আবেদন করতে হবে এবং সে আবেদনে সাড়া পাবার আশা করব। শুধু নিজ সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য নয়, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিভা নিয়োগ করবে সকলের কল্যাণে, সমাজের পক্ষে তা-ই কল্যাণকর নয় কি? যেখানে প্রত্যেকটি লোক তার যোগ্যতাকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করতে পারবে না, সে রকম নির্জীব সমতা সৃষ্টি

করতে আমরা চাই না। এ ধরনের সমাজ শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবেই। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি, ধনীরা কোটি টাকা উপার্জন করুক (অবশ্য কেবল সৎভাবে), কিন্তু যেন তারা সকলের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ উপদেশ একান্ত অভ্রান্ত। ত্যাগ করে ভোগ কর—এ মন্ত্র অসাধারণ জ্ঞানের উপর স্থিত। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একজন বাঁচে শুধু নিজেরই জন্য এবং প্রতিবেশীর কি হল না হল তার পরোয়াও করে না। তার পরিবর্তে এই মন্ত্রই সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য জীবনযাত্রার নূতন উপায় উদ্‌ঘাটিত করবে।

[হরিজন, ২২-২-'৪২]

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থ নৈতিক সমতা

অর্থ নৈতিক সমতার জন্য কাজ করার অর্থ হল ধন এবং শ্রমের চিরন্তন বিরোধ লোপ করা। অর্থাৎ একদিকে যাদের হাতে জাতির অধিকাংশ সম্পদ্ কেন্দ্রীভূত সেই কয়েকজন ধনী ব্যক্তিকে নীচে নামিয়ে আনা আর অন্যদিকে উলঙ্গ ও অর্ধাহারী কোটি কোটি লোকের অবস্থার উন্নতি বিধান করা। যতদিন ধনী ও বুভুক্ষু জনগণের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান থাকবে ততদিন অহিংস শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন স্পষ্টতঃই অসম্ভব। দিল্লীর

রাজপ্রাসাদ আর তার পাশে গরীব শ্রমিক শ্রেণীর শোচনীয় নিকৃষ্ট কুটিরের বৈষম্য স্বাধীন ভারতে একদিনও থাকতে পারে না। স্বাধীন ভারতের মাটিতে শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির মতই গরীব সমান ক্ষমতা ভোগ করবে। যদি ধনী স্বেচ্ছায় অর্থলব্ধ ক্ষমতা পরিত্যাগ এবং সকলের কল্যাণে ধন ভাগাভাগি করে ভোগ না করে তা হলে হিংস্র এবং রক্তাক্ত বিপ্লব একদিন নিশ্চিত আসবে। সমস্ত বিদ্রূপ সত্ত্বেও আমার অছিবাদ তত্ত্বে আমি অনুগত। একে কার্যকরী করা শক্ত ব্যাপার, এ সত্য কথা। সে রকম অহিংসাও অর্জন করা কঠিন। কিন্তু ১৯২০ সালে স্থির করেছিলাম যে সে চড়াই আমরা পার হব। এ প্রচেষ্টার সার্থকতায় আমি স্থিরনিশ্চয়।

[গঠনমূলক কার্যক্রম, ১৯৪৮]

প্রচার করার চেয়ে ভালো পথ আমি দেখিয়েছি। গঠন-মূলক কর্মপন্থা দেশকে লক্ষ্যের পথে অনেক দূর নিয়ে যাবে। এ কাজের পক্ষে সবচেয়ে শুভ সময় হল এই-ই। চরকা এবং আনুষঙ্গিক শিল্প যদি সম্পূর্ণ সফল হয়, বলতে গেলে তা সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সকল অসাম্য দূর করে দেবে। অহিংসার শক্তি সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান এবং দাসত্বের সঙ্গে সহযোগিতায় বুদ্ধিযুক্ত অসম্মতি নিশ্চয়ই সমতা আনবে।

[হরিজন ২৫-১-'৪২]

সমাজতান্ত্রিকরা ও সাম্যবাদীরা বলেন,—এখনই অর্থ নৈতিক সমতা আনবার জন্য তাঁরা কিছু করতে পারেন না। এর সপক্ষে

তাঁরা শুধু প্রচারকার্য চালাতে পারেন, ঘৃণা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে পারেন। তাঁরা বলেন—যখন তাঁরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পাবেন তখন সমতা বলবৎ করবেন। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্র থাকবে জনসাধারণের ইচ্ছা পূরণের জন্য। আদেশ করা বা জোর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছানুরূপ কাজ করার জন্য নয়। অহিংসার মাধ্যমে আমি অর্থনৈতিক সাম্য আনব। হিংসার পরিবর্তে প্রেমের শক্তি ব্যবহার করে জনসাধারণকে আমার মতে ফেরাব। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো সমাজকে নিজ মতে আনতে না পারি ততক্ষণ অপেক্ষা না করে সোজাসুজি নিজেকে নিয়েই কাজ শুরু করব। পঞ্চাশ খানা মোটর গাড়ী অথবা এমনকি দশ বিঘা জমিরও যদি মালিক হই তা হলে আমার কল্পিত অর্থনৈতিক সাম্য কার্যকরী করার আশা করতে পারি না—এ কথা বলাই বাহুল্য। এর জন্য নিজেকে ছোট করে দরিদ্রতম ব্যক্তিটির সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। গত পঞ্চাশ বছর বা তার বেশী সময় ধরে আমি এই-ই চেষ্টা করছি। সেজন্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী বলে দাবী করি। যদিও ধনীদের দেওয়া অন্যান্য সুবিধা ও মোটর গাড়ী ব্যবহার করে থাকি কিন্তু আমার উপর তাঁদের কোন প্রভাব নেই। জনতার স্বার্থে প্রয়োজন হলে এক মুহূর্তের নোটিশে ওই সুবিধা ও গাড়ী আমি দূর করে দিতে পারি।

[হরিজন, ৩১-৩-'৪৬]

মাদ্রাজ ভ্রমণের সময়ে গঠনমূলক কর্মী সম্মেলনে গান্ধীজীকে

জিজ্ঞেস করা হয়—"অর্থনৈতিক সমতা বলতে আপান সঠিক কী বলতে চান?" গান্ধীজীর উত্তর ছিল—তাঁর অর্থনৈতিক সাম্য এ কথা বলে না যে প্রত্যেকের একই পরিমাণ অর্থ থাকবে। সোজাসুজি কথায় এর অর্থ, প্রত্যেকে (স্ত্রী বা পুরুষ) তার নিজ প্রয়োজনের উপযোগী যথেষ্ট পাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,…একটি পিঁপড়ের চেয়ে একটি হাতির খাদ্যের প্রয়োজন হাজার গুণ বেশী। কিন্তু তা অসাম্যের নিদর্শন নয়। সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্যের প্রকৃত অর্থ ছিল: "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।" মার্কসের সংজ্ঞা ছিল তা-ই। যদি একজন একক ব্যক্তি, স্ত্রী ও চার সন্তানযুক্ত একজন ব্যক্তির সমান দাবী করেন তা হলে তা হবে অর্থনৈতিক সমতার বিরুদ্ধাচরণ।

"কেউ যেন উচ্চশ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যেকার তীব্র পার্থক্যকে, রাজপুত্র ও দরিদ্রের তফাৎকে এই বলে সমর্থন করার চেষ্টা না করেন যে প্রথমোক্ত পক্ষের দরকার বেশী। তা হবে নিরর্থক ভ্রান্ত যুক্তি এবং আমার যুক্তির ব্যঙ্গ মাত্র। ধনী ও দরিদ্রের বর্তমান বৈষম্য একটি বেদনাদায়ক দৃশ্য। বিদেশী সরকার শোষণ করছে দরিদ্র গ্রামবাসীদের। আবার স্বদেশবাসী শহুরেদের দ্বারাও তারা শোষিত। খাদ্য উৎপাদন করেও নিজেরা বুভুক্ষু থাকে। তারা দুগ্ধ উৎপন্ন করে অথচ তাদের ছেলেমেয়েদের চলতে হয় বিনা দুগ্ধে। এ লজ্জাজনক। প্রত্যেকেরই চাই সুষম খাদ্য, রুচিসম্মত সুন্দর বসতবাটী,

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার এবং রোগে চিকিৎসার যথেষ্ট সুযোগ।" একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধেই বাধানিষেধ আরোপ করতে চান না তিনি। দরিদ্রের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মিটাবার পরই সে কথা আসবে। যা সর্বাগ্রে দরকার তা চাই প্রথম।

[হরিজন, ৩১-৩-'৪৬]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবণ্টন মতবাদ

সমবণ্টনের প্রকৃত ভাবার্থ হল এই যে, প্রতিটি মানুষ স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জিনিসপত্র পাবে, তার চেয়ে বেশী নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কারো হজমশক্তি দুর্বল থাকে এবং তার রুটির জন্য মাত্র $\frac{1}{8}$ পাউণ্ড ময়দা দরকার হয় এবং অন্য জনের দরকার থাকে এক পাউণ্ড, তাদের দুজনেরই নিজ চাহিদা মেটাবার মত আর্থিক অবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই আদর্শকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য সমগ্র সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে। অহিংসার ভিত্তিতে তৈরী সমাজ অন্য কোন আদর্শ পোষণ করতে পারে না। অবশ্য হয়তো লক্ষ্যকে ঠিক মতো বাস্তবে পরিণত না করতে পারি, কিন্তু লক্ষ্য মনে রেখে কাছাকাছি পোঁছুবার জন্য যেন অক্লান্তভাবে কাজ করি। লক্ষ্যের দিকে যত এগুবো, ততই সন্তুষ্টি এবং আনন্দ পাব এবং সেই পরিমাণে অহিংস সমাজ সৃষ্টির কাজে লাগতে পারব।

অন্যেরা গ্রহণ করলেন কিনা সে জন্য অপেক্ষা না করেও একজন ব্যক্তির পক্ষে এ জীবনধারা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এবং যদি কোন ব্যক্তি জীবনে কোন আদর্শ অনুযায়ী চলতে পারেন তবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে একদল লোকও তা করতে পারেন। সত্যপথ গ্রহণ করবার জন্য অন্য কারো অপেক্ষার প্রয়োজন নেই—এ বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে

চাই। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যাবে না অনুভব করলে সাধারণতঃ নূতন কিছু আরম্ভ করতে মানুষ দ্বিধা বোধ করে। এ ধরনের মনোভাব বাস্তব পক্ষে উন্নতির পরিপন্থী।

এখন আসুন, সমবণ্টন কি ভাবে অহিংসার মাধ্যমে আনা যেতে পারে তা বিবেচনা করা যাক। এ আদর্শকে যিনি জীবনের অঙ্গীভূত করেছেন তাঁর পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা। ভারতের দারিদ্র্য মনে রেখে তিনি তাঁর চাহিদাকে ন্যূনতমের কোঠায় নামিয়ে আনবেন। তিনি আয় করবেন অসাধুতা বর্জন করে। ফাটকার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করবেন। নূতন ধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি বসবাস করবেন। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আত্ম-সংযম প্রতিপালন করতে হবে। যতদূর করা সম্ভব ততদূর যদি নিজের জীবনে পালন করেন তবেই তিনি এ আদর্শ তাঁর সঙ্গী ও প্রতিবেশীদের কাছে প্রচার করবার উপযুক্ত হবেন।

বস্তুতঃ ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদের জন্য সমবণ্টন নীতির মূলে থাকবে অছিবাদ। কারণ এ আদর্শ অনুসারে তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশীদের চেয়ে একটি আধলাও বেশী রাখতে পারবেন না। কি করে এ জিনিস কার্যকরী হতে পারে? অহিংস ভাবে? অথবা বিত্তবানদের অধিকার বিচ্যুত করে? এ করতে হলে স্বভাবতঃই হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। এই হিংসাত্মক কাজ সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। সমাজ তাতে আরও দরিদ্র হবে। কারণ যার ধনসঞ্চয়ের বুদ্ধি

আছে এরূপ মানুষের মেধা থেকে বঞ্চিত হবে সমাজ। সুতরাং অহিংসার পথ স্পষ্টরূপে শ্রেয়ঃ। ধনীর হাতেই তার ধনের মালিকানা থাকবে। সেই ধন থেকে ন্যায়সংগত ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহার করে বাকী ধন তিনি সমাজের জন্য খরচ করার অছি হবেন। এই যুক্তির মূলে অছির সততা ধরে নেওয়া হয়েছে।

কোন লোক যে-মুহূর্তে নিজেকে সমাজের ভৃত্য হিসাবে দেখে, সমাজের জন্যই রোজগার করে এবং তারই উপকারের জন্য ব্যয় করে, তখনিই তার রোজগারের মধ্যে পবিত্রতা আসে ও তার উদ্যমে অহিংসা আত্মপ্রকাশ করে। তা ছাড়া যদি মানুষের মন এরূপ জীবনের দিকে ফেরে তা হলে সমাজে কোনরূপ তিক্ততা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব আসবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ইতিহাসে কোনও সময় মানবপ্রকৃতির মধ্যে এ রকম পরিবর্তনের নজির আছে কিনা। ব্যক্তির পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে তবে সমগ্র সমাজে হয়েছে কিনা তার উদাহরণ নাও দেখানো যেতে পারে। তার অর্থ হল এই যে, এখনো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অহিংসার প্রয়োগ হয়নি। যে কারণেই হোক আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা দানা বেঁধেছে যে, অহিংসা প্রধানতঃ ব্যক্তির অস্ত্র এবং সেজন্য তার ব্যবহারও এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমিত থাকবে। বস্তুতঃ তা নয় কিন্তু। অহিংসা নিশ্চিত ভাবে সমাজের ধর্ম। জনসাধারণের মনে এই সত্য সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মানোই আমার

প্রচেষ্টা ও প্রয়োগ। এই অঘটন ঘটনের যুগে কেউই বলবে না যে কোন জিনিস বা ধারণা শুধু নবীনত্বের জন্যই মূল্যহীন। এ কাজ অসম্ভব কারণ এতে বাধাবিপত্তি অনেক—এ কথা বলাও আবার যুগোচিত ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। যে সমস্ত জিনিস স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না, তেমন বস্তু প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে। অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান সময়ে হিংসার ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্যজনক আবিষ্কার ইত্যাদি আমাদের অবিরাম বিস্মিত করছে। কিন্তু আমি মনে করি যে অহিংসার ক্ষেত্রে আরও অনেক অভাবনীয় এবং আপাত-অসম্ভাব্য আবিষ্কার হবে। ধর্মের ইতিহাস এরূপ উদাহরণে পূর্ণ।

অবশ্য যদি যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ধনীরা দরিদ্রদের প্রকৃতপক্ষে অভিভাবক না হন এবং দরিদ্র যদি ক্রমাগত ক্ষুধায় নিষ্পিষ্ট হয় ও মারা যায় তা হলে কি করা যেতে পারে? এই ধাঁধার সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমি অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্যকে সঠিক ও অভ্রান্ত উপায় বলে আবিষ্কার করেছি। সমাজের দরিদ্রদের সহযোগ ব্যতিরেকে ধনী ধন সঞ্চয় করতে পারে না। আদিকাল থেকেই মানুষ হিংসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ নিজের ভিতরকার পশু থেকে তা পেয়েছে। কেবলমাত্র যখন সে চতুষ্পদ জন্তু থেকে দ্বিপদ মানুষের অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়েছে তখনই অহিংসা শক্তির জ্ঞান তার অন্তরে প্রবেশ করেছে। ধীরে ধীরে কিন্তু নিঃসন্দেহে এই জ্ঞান তার মধ্যে বেড়ে উঠেছে। যদি এই জ্ঞান

দরিদ্রদের মধ্যে আরও অনুপ্রবিষ্ট ও বিস্তৃত হত তা হলে তারা শক্ত হত এবং যে অসাম্য তাদের নিষ্পেষিত করছে, যার ফলে তারা বুভুক্ষু, তার হাত থেকে অহিংস উপায়ে নিজেদের মুক্ত করবার উপায় শিখত।

[হরিজন, ২৫-৮-'৪০]

সপ্তম অধ্যায়

অছিবাদ—অলীক কল্পনা নয়

ভালবাসা এবং একচেটিয়া মালিকানা কখনও একসঙ্গে চলতে পারে না। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, যেখানে পূর্ণপ্রেম সেখানে পূর্ণ মালিকানা ত্যাগ। শরীরই আমাদের শেষ ব্যক্তিগত সম্পদ। অতএব মানবসেবার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন এবং দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকলেই মানুষ পরিপূর্ণ প্রেমের অনুশীলন করতে পারে এবং পুরাপুরি অসংগ্রহীও হতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র তত্ত্ব হিসাবেই এ কথা সত্য। বাস্তব জীবনে আমরা বিশুদ্ধ প্রেম খুব কমই দেখাতে পারি। কারণ সম্পত্তি হিসাবে শরীর আমাদের সঙ্গে সকল সময়েই থাকবে। মানুষ চিরদিন অসম্পূর্ণ এবং সব সময়ে তার কাজ হবে সম্পূর্ণ হবার চেষ্টা। অতএব যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকব ততদিন ভালবাসায় পূর্ণতা লাভ অথবা সম্পূর্ণ অধিকার ত্যাগ দুর্লভ

আদর্শ হিসাবেই থাকবে। কিন্তু অবিরাম গতিতে কঠোর চেষ্টা করে আমরা তার দিকে অগ্রসর হব।

যাঁরা ধনী, দরিদ্রের প্রয়োজনে ধনের অছি হিসাবেই তাঁদের আচরণ করতে বলা হচ্ছে। আপনি বলতে পারেন অছিবাদ অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু জনসাধারণ যদি অবিরাম এ বিষয়ে ধ্যান করে এবং তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করে তা হলে পৃথিবীতে জীবন বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে প্রেম-নিয়ন্ত্রিত হবে। পরিপূর্ণ অছিবাদ ইউক্লিডের বিন্দুর সংজ্ঞার মতই বস্তু-নিরপেক্ষ এবং অনুরূপ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যদি কঠোর চেষ্টা করা যায় তা হলে পৃথিবীতে সাম্য অবস্থা লাভের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারা যাবে। অন্য উপায়ে সেরূপ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন॥ যদি আপনি মনে করেন যে ব্যক্তিগত মালিকানা অহিংসার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন তা হলে আপনি তা বরদাস্ত করেন কেন?

উত্তর॥ যারা উপার্জন করে অথচ স্বেচ্ছায় তা মানব-কল্যাণে ব্যয় করতে চায় না, তাদের দুর্বলতার প্রতি এ এক-প্রকার অনুকম্পা। এ মানুষকে করতে হয়।

প্রশ্ন॥ তা হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই তো হয়। তাতে হিংসার পরিমাণ ন্যূনতম হবে।

উত্তর॥ ব্যক্তিগত মালিকানার চেয়ে তা উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাও হিংসার কারণে ত্রুটিপূর্ণ। যদি রাষ্ট্র ধনতন্ত্রকে হিংসার

দ্বারা অবদমিত করে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই হিংসার কুপ্রভাবে পড়বে এবং কোন সময়েই অহিংসার বিকাশ করতে পারবে না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিয়ন্ত্রিত ও ঘনীভূত হিংসার প্রতীক রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা আছে, কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্র আত্মাশূন্য যন্ত্র, সেইজন্য হিংসার অভ্যাস কখনও ছাড়তে পারবে না। কারণ হিংসার উপরই তার অস্তিত্ব। সে কারণেই আমি অছিবাদ তত্ত্বে বেশী আস্থা রাখি।

প্রশ্ন ॥ একটা সুনির্দিষ্ট উদাহরণে আসা যাক। মনে করুন কোন শিল্পী তাঁর ছেলের কাছে কয়েকখানা চিত্র রেখে গেলেন। জাতির কাছে ওগুলির কি মূল্য সে তা অনুধাবন করতে না পেরে বিক্রী করে দিল অথবা নষ্ট করে ফেলল। ফলে একজন ব্যক্তিবিশেষের বোকামীর জন্য জাতিকে মূল্যবান কিছু হারাতে হল। যদি আপনার নিশ্চিত ধারণা হয় যে সে ছেলে কখনও অছি হবে না তা হলে সামান্য পরিমাণ হিংসার সাহায্যে ওই সমস্ত চিত্রাবলী রাষ্ট্রের নিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ॥ হ্যাঁ, রাষ্ট্র তা করবে। বস্তুতঃ সে সব জিনিস নিয়ে নেবে এবং যদি রাষ্ট্র এজন্য অল্প পরিমাণে হিংসার আশ্রয় নেয়, সেটা ঠিক কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তাতেও ভয়ের কারণ রয়েছে। ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর রাষ্ট্র প্রয়োজনাতিরিক্ত হিংসার প্রয়োগ করবে—এ ভয় সব সময়েই আছে। যাঁদের নিয়ে কথা তাঁরা যদি অছি হিসাবে আচরণ

করেন, অত্যন্ত খুশী হব। কিন্তু যদি তা না করেন, আমার বিশ্বাস মালিকানা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করতে হবে। যতদূর কম সম্ভব হিংসার সাহায্যে রাষ্ট্র তা করবে। সেজন্য গোল টেবিল বৈঠকে বলেছিলাম, প্রত্যেক কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়ে বা না দিয়েই তা করতে হবে।

ব্যক্তিগত ভাবে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া আমি পছন্দ করব না। কিন্তু অছিবাদের বিস্তার কামনা করি। ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে যতখানি হিংসা, রাষ্ট্রের হিংসা তার চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই প্রথমোক্ত হিংসা কম ক্ষতিকর। যা হোক, যদি অনিবার্য হয় তবে সর্বনিম্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে সমর্থন করব।

মানুষ অভ্যাসের দাস। সে কথা স্বীকার করেও আমি মনে করি, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে বাঁচাই তার পক্ষে ভাল। আরও বিশ্বাস করি, শোষণের পরিমাণ সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনবার মত ইচ্ছাশক্তির বিকাশ মানুষের পক্ষে সম্ভব। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিকে আমি সবচেয়ে ভীতিজনক বলে মনে করি। কারণ আপাতদৃষ্টিতে শোষণকে হ্রাস করে কাজ করলেও মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে রাষ্ট্র মানবজাতির পরম অকল্যাণ সাধন করে। কারণ ব্যক্তিত্বই প্রগতির মূল। অছিবাদকে মানুষ গ্রহণ করেছে এ রকম একাধিক দৃষ্টান্তের কথা জানি।

কিন্তু রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের জন্যে বেঁচেছে, এমন দৃষ্টান্ত জানি না।

[মডার্ন রিভিয়্যু, অক্টোবর ১৯৩৫]

অষ্টম অধ্যায়

শ্রমিকের আত্মশক্তির বোধ

প্রশ্ন॥ শ্রমিকেরা হিংসা ছাড়া কি ভাবে ন্যায় বিচার পাবে? তাদের চেষ্টাকে দমন করবার জন্য যদি ধনিক সম্প্রদায় বলপ্রয়োগ করে, শ্রমিকেরাও তাদের দমনকারীদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে না কেন?

উত্তর॥ অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই 'ঘুষির বদলে ঘুষি'— এই আরণ্য নীতি রয়েছে। সে নীতি মানুষের পক্ষে অনুপযুক্ত। তা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই অহিংসা নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করছি।

হয়তো আপনি জানেন না, আমেদাবাদের মত জায়গায় আমাকে একটি শ্রমিক সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা মনে করা হয়। অনেক শ্রমবিশেষজ্ঞ আমেদাবাদ পরিদর্শন করেছেন। তাঁদের অনেকেই অযাচিতভাবে ওই সংস্থার সুখ্যাতি করেছেন। এই শ্রমিক সংস্থার মাধ্যমে গত পনের বৎসরে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তারই যোগসূত্রে অহিংসার

পদ্ধতি প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করছি। সুতরাং আমি এখন যা বলতে চাইছি তা প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত এবং যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাতেই প্রযোজ্য। আমার বিনীত মত এই যে, শ্রমিক সম্প্রদায় সব সময়েই নিজমতকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে পারে যদি তারা যথেষ্ট পরিমাণে একতাবদ্ধ এবং আত্মত্যাগী হয়। ধনিক শ্রেণী যত অত্যাচারীই হোক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত এবং শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালনা করেন তাঁদের নিজেদেরই ধারণা নেই যে শ্রমিকদের মধ্যে কী পরিমাণ সম্ভাবনা রয়েছে। মালিকের মধ্যে তা নেই। যদি শ্রমিক সম্প্রদায় শুধু বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারত যে শ্রমিকদের বাদ দিলে ধনী মালিকেরা সম্পূর্ণরূপে অসহায় তা হলে অনতিবিলম্বেই শ্রমিকেরা নিজমর্যাদা পেত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ধনের এমন সম্মোহনী শক্তির অধীন যে আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে ধনই এ পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান। কিন্তু মুহূর্তের চিন্তায় বোঝা যাবে শ্রমিকদের যে সম্পদ আছে ধনীর কখনোই তা হতে পারে না। রাস্কিন তাঁর যুগে শিখিয়েছিলেন শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার সমকক্ষ আর কিছু নেই। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা আমরা বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারিনি। বর্তমান মুহূর্তে একজন ইংরেজ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সত্যিসত্যিই সেই নীতি প্রয়োগ করছেন। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ্ এবং পুঁজিবাদীও। হৃদয়ের সূক্ষ্মানুভূতির

ফলে রাস্কিন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনিও সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। শ্রমিকদের জন্য অতি আবশ্যক বার্তা তিনি বয়ে এনেছেন। তিনি বলেন, একটি ধাতুর টুকরা মূলধনের উপাদান এ কথা চিন্তা করা ভুল। তিনি বলেন, উৎপন্নের পরিমাণই মূলধন সে কথা ভাবাও ভুল। উৎস থেকে বিচার করলে শ্রমিকরাই মূলধন। সেই জীবন্ত মূলধন কখনোই ফুরোবে না।

ওই নিয়মের উপর নির্ভর করেই আমরা আমেদাবাদে শ্রম-সংস্থার মধ্যে কাজ করছি। সে নিয়মের ভিত্তিতেই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমাদের কাজ। এই সেই নিয়ম যার স্বীকৃতি শতাব্দীর উৎপীড়ন থেকে ছয় মাসে চম্পারনের সতের লক্ষ লোককে মুক্তি দিয়েছে। সে উৎপীড়ন যে কী ছিল তা বলতে ইতস্ততঃ করব না। কিন্তু সেই সমস্যা সম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তিরা আমার প্রদত্ত তথ্যের প্রত্যেকটি পরীক্ষা করে দেখতে সমর্থ হবেন। এখন আমি কী করেছি আপনাদের তাই বলব। ইংরেজীতে একটি চমৎকার প্রভাবশালী শব্দ আছে। সে শব্দ আপনাদের ফরাসী ভাষায়ও আছে। পৃথিবীর সকল ভাষায় আছে। তা হল 'না'। আমাদের শক্তির গোপন দিক হল এই যে, যখন মালিক চান তাঁর শ্রমিকরা বলুক 'হ্যাঁ', শ্রামিক তখন গর্জন করছে 'না'। অবশ্য 'না' বলা যদি তার সত্যিকার মনোগত অভিপ্রায় হয়। হ্যাঁ এবং না—এই দুইয়ের মধ্যে বাছাই করার স্বাধীনতা তাদের আছে। এ কথা উপলব্ধি

করলেই শ্রমিক মূলধনের প্রভাব হতে মুক্ত, মূলধনই তখন শ্রমিকের দ্বারস্থ। ধনিকের হাতে ব্যবহারের জন্য বন্দুক, এমনকি বিষাক্ত গ্যাস আছে। কিন্তু তাতে বিচলিত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। শ্রমিক সম্প্রদায় যদি 'না' ব্যবহার করে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা পায় তা হলে বন্দুক বা বিষাক্ত গ্যাস থাকা সত্ত্বেও ধন সম্পূর্ণভাবে অসহায়। তা হলে শ্রমিকের পক্ষে প্রতিশোধ নেবার দরকার হবে না। বিষাক্ত গ্যাস এবং বুলেট গ্রহণ করেও সে প্রকাশ্যভাবে অবাধ্য হয়ে দাঁড়াতে এবং নিজের 'না' সম্বন্ধে জোর দিতে পারবে। শ্রমিকদের প্রায়ই ব্যর্থ হবার মূল কারণ হল, আমি যে ভাবে প্রস্তাব করছি সে ভাবে পুঁজি বা ধনকে নিষ্ক্রিয় না করে তারা (আমি নিজেকেও একজন শ্রমিক মনে করে বলছি) ওই ধনকে দখল করতে এবং নিজেই নীচু স্তরের ধনিক হতে চায়। সুতরাং উপযুক্ত ভাবে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ ধনীরা যখন শ্রমিকদের মধ্যেই ধনীর স্থান অধিকার করার প্রার্থী দেখেন তখন তাদের দমন করার কাজে তাদেরই একাংশকে লাগান। যদি আমরা সত্যসত্যই এই মোহাচ্ছন্ন জাদুর বশীভূত না হতাম তবে প্রত্যেকে, পুরুষ এবং নারী, অনায়াসেই এই ন্যূনতম সত্যটি চিনতাম। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রকারের প্রয়োগের ফলে নিজের বেলায় তা সপ্রমাণ করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি (এ কথা বলার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন), আপনাদের সামনে রাখা আমার এ

পরিকল্পনা অতিমানবীয় কাজ কিছু নয়। বরং প্রত্যেক শ্রমিক স্ত্রী ও পুরুষের সাধ্যায়ত্ত। আর দেখবেন, অহিংসা পরিকল্পনায় শ্রমিকদের যা করবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তুলনায় তা বেশী কিছু নয়। একজন সুইস্ সৈন্য বন্দুকের গুলির সামনে যা করবে অথবা সর্বাঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একজন সাধারণ সৈনিককে যা করতে বলা হয়, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। যখন সন্দেহাতীত ভাবে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত বা ধ্বংস করতে চেষ্টা করে তখন নিজের জীবন সম্বন্ধেও সে বেপরোয়া। তাই আমি চাই তারা সৈন্যদের সাহসকে অনুকরণ করুক, কিন্তু তাদের পশুত্বকে নয়। অর্থাৎ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা অনুকরণ নয়। আমি বলতে চাই, যে শ্রমিক কোন অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে বা আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র না রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং মরবার সাহস রাখে সে আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের শৌর্য প্রদর্শন করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১-'৩২]

নবম অধ্যায়

ধনীদের পথ-বাছাই

জাপানী অভিজাতদের মত জমিদার ও তালুকদারেরা অধীনস্থ প্রজাদের কল্যাণের জন্য ধনসম্পত্তির অছি হিসাবে

নিজেদের গণ্য করবেন। শ্রমের ন্যায়সংগত দস্তুরীর বেশী গ্রহণ করবেন না। বর্তমানে অর্থবানদের একান্ত অপ্রয়োজনীয় জাঁকজমক এবং অমিতব্যয়িতা আর রায়তদের অপরিচ্ছন্ন পরিবেষ্টনী ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ—এই তুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। যদি ধনিক শ্রেণী এ যুগের ইশারা বুঝে নিজেদের সমস্ত ধনসম্পদের উপর ভগবদ্দত্ত অধিকারের ধারণা পরিবর্তন করেন তবে বিস্ময়কর ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অধুনা পল্লী নামধেয় সাতকোটি গোবরের স্তূপকে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং আরামের আবাসস্থলে পরিণত করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, ধনীরা যদি জাপানের সামুরাইদের অনুসরণ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ক্ষতি কিছুই হবে না, বরং পুরো লাভ হবে।

এই তুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া ধনীর গত্যন্তর নেই। এক, নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সমর্পণ করা, যার ফলে সকলের সত্যিকারের সুখ। অন্যদিকে, ধনী যদি সময় থাকতে সচেতন না হন তা হলে জাগ্রত কিন্তু অজ্ঞ বুভুক্ষু অগণিত জনসমাজ দেশকে এক আসন্ন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবিয়ে দেবে, যা এক শক্তিমান সরকার অস্ত্রবলের সাহায্যেও রোধ করতে পারবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১২-'২৯]

অহিংস উপায়ে আমি জমিদার এবং অন্যান্য ধনীদের মতের পরিবর্তন চাই। সুতরাং আমার কাছে শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিহার্যতা বলে কিছু নেই। কারণ অহিংসার অত্যাবশ্যক

অংশ হল ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করা। যে মুহূর্তে জমির চাষী নিজেদের শক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবে, জমিদারী প্রথার খারাপ দিকটা ধ্বংস হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ভাবে নিজেদের এবং সন্তানসন্ততিদের খাওয়া পরা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার মত পর্যাপ্ত মজুরী চাষীরা না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষেতে কাজ করবে না বললে বেচারা জমিদার কি করতে পারে? বস্তুতঃ পক্ষে মজুরেরাই তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর মালিক। যদি তারা বুদ্ধির সঙ্গে একত্রিত হয় তবে অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হবে। এই হেতু আমি শ্রেণী-সংঘাতের প্রয়োজন অনুভব করি না। যদি বুঝতে পারতাম যে এ অনিবার্য, সে কথা প্রচার করতে ও শিক্ষা দিতে দ্বিধা করতাম না।

[হরিজন, ৫-১২-'৩৬]

দশম অধ্যায়

অহিংসার শক্তি

প্রশ্ন॥ দরিদ্রের প্রতি ধনীর কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করার ব্যাপারে সত্যাগ্রহের কী স্থান?

উত্তর॥ বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যে রকম, সে রকম। সর্বজনীন ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নিয়ম এই সত্যাগ্রহ। পরিবার

হতে শুরু করে অন্য সব ক্ষেত্রেই একে প্রসারিত করা যায়। ধরুন, একজন জমিদার তাঁর প্রজাদের শোষণ করেন এবং অন্যায় ভাবে তাদের পরিশ্রমের ফল গ্রহণ করে তা প্রয়োগ করেন নিজের ব্যবহারে। তারা যখন প্রতিবাদ জানায়, তিনি কর্ণপাত করেন না। তিনি এত পরিমাণ স্ত্রীর জন্য, এত পরিমাণ তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য—ইত্যাদি আপত্তি তোলেন। প্রজারা অথবা যাঁরা তাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং যাঁদের প্রভাব আছে তাঁরা জমিদারের স্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবেন যেন তিনি তাঁর স্বামীকে বুঝিয়ে বলেন। স্ত্রী সম্ভবতঃ বলবেন যে তাঁর নিজের জন্য স্বামীর শোষিত অর্থের প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ভাবে ছেলেমেয়েরাও বলবে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনের জন্য উপার্জন করবে।

ধরা যাক কারো কথা তিনি শুনলেন না। অথবা তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা প্রজার বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়াল। তা হলেও প্রজারা তাতে মাথা নত করবে না। যদি তা করতে বলা হয় তা হলে তারা বেরিয়ে চলে আসবে। কিন্তু এ কথা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়ে আসবে, যে চাষ করে জমির মালিক সে-ই। মালিক সমস্ত জমি নিজেই চাষ করতে পারে না এবং কৃষকদের ন্যায্য দাবীর কাছে নত হতে বাধ্য। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, অন্যান্যদের দ্বারা চাষীদের স্থান পূরণ হতে পারে। তখন হিংসা বাদে সর্বপ্রকারের আন্দোলন চলতে থাকবে। স্থান পূরণকারী চাষীরা নিজেদের ভুল বুঝে উৎখাত চাষীদের সঙ্গে

যোগ না দেওয়া পর্যন্ত ওই আন্দোলন চলবে। অতএব সত্যাগ্রহ জনমনকে শিক্ষিত করার একটি উপায়। সত্যাগ্রহ সমাজের সকল স্তরকে জনমত গঠনে সহায়তা করবে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। হিংসা এ পদ্ধতির বিরোধী এবং সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে দূরে পিছিয়ে রাখে।

সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা হল :—

১। বিপক্ষের প্রতি সত্যাগ্রহীর অন্তরে কোন প্রকার ঘৃণা থাকবে না।

২। বিষয়বস্তু যেন সত্য এবং প্রকৃত হয়।

৩। যতদিন পর্যন্ত নিষ্পত্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত সত্যাগ্রহীকে দুঃখকষ্ট বরণ করবার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

[হরিজন, ৩১-৩-'৪৬]

প্রশ্ন॥ আপনি বলছেন যে কোন রাজা, জমিদার অথবা ধনী ব্যক্তির গরীবের অছি হওয়া দরকার। এ রকম কিছুর অস্তিত্ব কোথাও বর্তমানে আছে বলে মনে করেন কি? অথবা আশা করেন যে সে ভাবে তাদের রূপান্তর হতে পারে?

উত্তর॥ আমার মনে হয় এমনকি আজও গুটি কয়েকের অস্তিত্ব আছে, যদিও পুরাপুরি অর্থে নয়। তারা নিশ্চিন্ত ভাবেই সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। যা হোক, প্রশ্ন করা যেতে পারে

বর্তমান রাজারা এবং অন্যান্যরা দরিদ্রের অছি হবে তা আশা করা যায় কি ? যদি নিজেদের ইচ্ছায় অছিতে পরিণত না হয়, ঘটনার বেগ এ সংস্কার সাধনে তাদের বাধ্য করবে। অবশ্য যদি ধ্বংস বরণ করে তবে অন্য কথা। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হলে জনমত এমন কাজ করবে হিংসা যা কখনোই করতে পারে না। সাধারণ মানুষ যতদিন না নিজেদের শক্তি অনুভব করতে পারবে ততদিন জমিদার, ধনিক ও রাজাদের শক্তি থাকবে। যদি জনগণ জমিদারী অথবা ধনতন্ত্রের কু-শক্তির সঙ্গে অসহযোগিতা করে তা হলে পুষ্টিহীনতায় এর মৃত্যু নিশ্চিত। পঞ্চায়েত রাজে শুধু পঞ্চায়েতকেই মান্য করা হবে এবং পঞ্চায়েত কেবল তাদের তৈরী আইনকানুনের মধ্য দিয়েই কাজ করতে পারবে।

[হরিজন ১-৬-'৪৭]

একাদশ অধ্যায়

কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন ॥ আপনার লেখা থেকে এ ধারণাই মনে আসে যে, আপনার 'অছি' একজন দয়ালু বিশ্বপ্রেমিক ও দাতার চেয়ে বেশী কিছু নয়। যেমন প্রথম পার্শী ব্যারন টাটা, ওয়াদিয়া, বিড়লা, শ্রীবাজাজ এবং এই-জাতীয় ব্যক্তি। এ কি সত্যি? আপনি অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করবেন কি? কাকে আপনি ধনিকের প্রাথমিক অথবা যোগ্য উত্তরাধিকারী মনে করেন? আয় এবং পুঁজির পরিমাণ বা অংশের উপর কি কোন সীমা থাকবে, যা সে নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য তথা জনগণের জন্য নয় এমন কাজে ব্যয় করতে পারবে? যিনি এ সীমা অতিক্রম করে যাবেন তাঁকে কি ওইরূপ করা থেকে নিবারণ করা যাবে? অছি হিসাবে যদি তিনি অযোগ্য অথবা নিজের কর্তব্য পালনে অসমর্থ হন, তাঁকে কি সরানো যাবে? রাষ্ট্র অথবা ওই সম্পত্তি ভোগের অধিকারী ব্যক্তি তাঁর কাছে হিসাব চাইতে পারবে কি? জমিদার এবং রাজকুমারদের বেলাতেও কি এই নীত প্রযোজ্য? অথবা তাঁদের অছি ব্যবস্থা হবে ভিন্ন প্রকৃতির?

উত্তর ॥ যদি অছিবাদের আদর্শ গৃহীত হয়, তা হলে যাকে বিশ্বপ্রেমিকতা বলে জানি তা লোপ পাবে। যাঁদের নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র যমুনালালজীই কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু কাছাকাছি মাত্র। একজন অছির

জনসাধারণ ছাড়া অন্য কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। যে রাষ্ট্রের ভিত্তি অহিংসা, সেখানে অছিদের নিযুক্তি নিয়ন্ত্রিত করা হবে। রাজপুত্র এবং জমিদারেরা অন্যান্য ধনবানদের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত হবেন।

[হরিজন, ১২-৪-'৪২]

প্রশ্ন ॥ খোলাখুলি বা প্রচ্ছন্ন হিংসার মাধ্যম ছাড়া ধন সংগ্রহ কি সম্ভব?

উত্তর ॥ হিংসার পথে ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে এ ধরনের ধন সঞ্চয় অসম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক অহিংস সমাজে তা শুধু সম্ভব নয়, আকাঙ্ক্ষিত এবং অনিবার্য।

প্রশ্ন ॥ কোন মানুষ পার্থিব অথবা নৈতিক সম্পদ সঞ্চয় করেন কেবলমাত্র সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য ও সহযোগিতায়। তা হলে ওই সঞ্চয় প্রধানতঃ তার ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য ব্যবহারে কি তার কোন নৈতিক অধিকার আছে?

উত্তর ॥ না, তার কোন নৈতিক অধিকার নেই।

প্রশ্ন ॥ কি ভাবে একজন অছির উত্তরাধিকারী নির্ণয় করা হবে? তাঁর কি শুধু নাম প্রস্তাব করবার ক্ষমতা থাকবে? আর চূড়ান্ত নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে?

উত্তর ॥ যে মূল স্বত্বাধিকারী সর্বপ্রথম অছি হলেন, তাঁকে নিজের পছন্দমত বাছাই করবার অধিকার দিতে হবে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। এ রকম বন্দোবস্তে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি দুইয়েরই পক্ষে একটা সীমা থাকবে।

প্রশ্ন ॥ অছিবাদের কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয় তখন হিংসার যন্ত্র স্বরূপ যে রাষ্ট্র, মালিকানা কি তার হাতে থাকবে? অথবা গ্রাম-প্রজাসভা, পৌরসভা প্রভৃতির হাতে? রাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত আইন থেকেই অবশ্য ওই সকল সভা নিজেদের শেষ কর্তৃত্ব লাভ করে।

উত্তর ॥ এরূপ প্রশ্ন গোলমেলে চিন্তাধারার পরিণতি। পরিবর্তিত অবস্থায় বৈধ মালিকানা অছির উপর ন্যস্ত, রাষ্ট্রের উপর নয়। বাজেয়াপ্তকরণকে ঠেকিয়ে প্রকৃত মালিককে তার নিজের ক্ষমতায় ধরে রাখবার জন্যই কার্যক্ষেত্রে অছিবাদ এল। তিনি (বক্তা) এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, রাষ্ট্র সকল সময়েই হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাত্ত্বিক ভাবে তা হতে পারে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এই দাবী।

[হরিজন, ১৬-২-'৪৭]

দ্বাদশ অধ্যায়

অনন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করা

(প্যারেলাল কর্তৃক লিখিত)

১৯৪২ সালে পুণায় শেষ আটক থাকা কালে অছিবাদ আদর্শের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে এবং বর্তমান পৃথিবীতে কি ভাবে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় সে বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"বর্তমান সময়ে একে পাওয়ার একমাত্র গণতান্ত্রিক পথ হল এর পক্ষে মত গঠন করা।"

আমি বললাম—"সম্ভবতঃ আপনি অছিবাদ মালিক শ্রেণীর কাছে উপস্থিত করেছেন এইজন্য যে, অহিংসা জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক রকমের ত্যাগ দাবী করতে পারে। তা সত্ত্বেও তারা নিজের মাথাটা আক্রমণকারীর সামনে এগিয়ে দেবে এতটা প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। সেজন্য মালিক শ্রেণীকে অসম্ভাব্য কিছু করতে বলার পরিবর্তে আপনি যুক্তি-যুক্ত এবং সাধ্য বিকল্প তাদের কাছে উপস্থাপিত করলেন।"

গান্ধীজী॥ অহিংসা যে পরিমাণ আত্মত্যাগ দাবী বা নির্দেশ করতে পারে তার কোন সীমা আছে বলে আমি স্বীকার করি না। অছিবাদ তত্ত্ব নিজের গুণের উপরই নির্ভর করে।

প্যারেলাল॥ পরিবর্তন মালিক শ্রেণীর খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করে, এবং যতদিন পর্যন্ত না তাদের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়,

আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে—আপনি নিশ্চয়ই সে কথা বলছেন না? যদি ধীর ও মন্থর গতিতে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তবে অতীতের সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছিন্নতার ফলে যে বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি হয় তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের মার্কস্‌পন্থী বন্ধুরা বলেন, শুধু সর্বহারার একনায়কত্বের মাধ্যমে একটি প্রকৃত সামাজিক বিপ্লব আসতে পারে। আপনিও আমাদের শিখিয়েছেন যে, রাজনীতিতে সংস্কারবাদ বিপ্লবকে ধ্বংস করে। সামাজিক পরিবর্তনের বেলায়ও কি এ সমভাবে প্রযোজ্য নয়? যা হোক, যদি উচ্চতর কোন আদর্শের জন্য অহিংসা তার বিরোধীকে, এমনকি নিজেকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করার জন্য প্রবৃত্ত করবার মত ক্ষমতা রাখে, যেমন আপনি বলেছেন তা সম্ভব; তা হলে মালিক শ্রেণীকে তাদের বিরাট্ সম্পত্তি পরিত্যাগ করাতে আমরা পারছি না কেন? আপনি এ কথা সত্য বলে স্বীকার করছেন যে, বর্তমানে বিরাট্ সম্পত্তি অধিকার শোষণের ফল। তবে অছিবাদ আনছেন কেন তার মধ্যে? অনেকে আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে এটা একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু হবে না। অথবা এটা কি সত্য যে, সর্বোপরি অহিংসার শক্তিও সীমাবদ্ধ?

গান্ধীজী॥ সম্ভবতঃ তোমার মনের মধ্যে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাইকারী হারে মালিক শ্রেণীকে স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা এবং তার সম্পদ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার ফলে সেখানে একটা প্রচণ্ড বৈপ্লবিক উৎসাহ

সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমি বলছি, আমাদেরটা হবে আরও বৃহত্তর বিপ্লব। আমরা যেন ব্যবসায়ী প্রতিভাকে এবং যেভাবে মালিক শ্রেণী বংশপরম্পরাক্রমে অভিজ্ঞতা ও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে তার মূল্য হ্রাস না করি। আমার পরিকল্পনায় এর খোলাখুলি প্রয়োগ জনগণের কল্যাণে আসবে। যতদিন পর্যন্ত না শক্তি আমাদের করায়ত্ত হয়, প্রয়োজনের খাতিরেই মত পরিবর্তন করানো হবে আমাদের অস্ত্র। কিন্তু ক্ষমতা করায়ত্ত হবার পর সেটা হবে আমাদের বেছে নেবার প্রশ্ন। আইন করার পূর্বে হবে মত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। মত পরিবর্তন না হলে আইন পুঁথিগতই থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আজ আমাদের আইনগত ক্ষমতা আছে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রয়োগ করার, কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারি না, কারণ জনতা প্রস্তুত নয়।

প্যারেলাল ॥ আপনি বলছেন যে, সংস্কারের পূর্বে চাই স্বেচ্ছায় মত পরিবর্তন। প্রশ্ন হচ্ছে কার মত পরিবর্তন? যদি আপনি মনে করেন জনসাধারণের মত পরিবর্তন, তা হলে তারা এমনকি আজই প্রস্তুত। যদি অন্যদিকে আপনি মনে করেন যে মালিক শ্রেণীর মত পরিবর্তন, তবে আমরা অনন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।

গান্ধীজী ॥ আমি বলতে চাই উভয়েরই মত পরিবর্তন।

আমার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে তিনি বলে চললেন—"দেখ, যদি মালিক শ্রেণী স্বেচ্ছায় অছিবাদ গ্রহণ না

করে, জনমতের চাপে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সেই জনমত এখানে যথেষ্টভাবে সংগঠিত হয়নি।”

কিছুক্ষণ আগে গান্ধীজী যা বলছিলেন সে কথায় ফিরে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—“ক্ষমতা বলতে আপনি কী বোঝেন ?”

গান্ধীজী ॥ ক্ষমতা বলতে আমি মনে করি জনতার ভোট দেবার ক্ষমতা। তা এত বেশী উদারভিত্তিক হবে যে সংখ্যা-গরিষ্ঠের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা যায়।

প্যারেলাল ॥ পার্লামেণ্টারী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা জনতা ক্ষমতায় আদৌ আসতে পারবে কি ?

গান্ধীজী ॥ কেবলমাত্র পার্লামেণ্টারী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নয়। আমার শেষ পর্যন্ত ভরসা হল অহিংস অসহযোগের উপর। বাইশ বছর ধরে তা গড়তে চেষ্টা করছি।

প্যারেলাল ॥ অহিংসার মারফতে ক্ষমতা দখল কি সম্ভব ? আমাদের সমাজবাদী বন্ধুরা বলেন যে, এখন কিছু পরিমাণে অহিংসার অসীম সম্ভাবনার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস হয়েছে কিন্তু তাঁদের বক্তব্য,—ক্ষমতা দখল করতে অহিংসা জনতাকে কিভাবে সহায়তা করবে তাঁরা সেটা দেখতে পাচ্ছেন না। আপনিও সেই কথাই বলেছেন। সমাজবাদীরা বলতে চান, সেখানেই অহিংসার অযাথার্থ্য নিহিত।

গান্ধীজী ॥ এক হিসাবে তাঁরা ঠিক। অহিংসার প্রকৃতি অনুসারেই অহিংসা ক্ষমতা দখল করতে পারে না। সেটা তার

লক্ষ্যও হতে পারে না। কিন্তু অহিংসা আরও বেশী কিছু করতে পারে। এ ফলপ্রসূ ভাবে সরকারী যন্ত্র দখল না করেও ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত এবং পথপ্রদর্শন করতে পারে। সেখানেই তার মহিমা। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। যদি জনসাধারণের অহিংস অসহযোগ এত সম্পূর্ণ হয় যে শাসন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বসে পড়ে এবং ফলে শূন্যে পরিণত হয়, জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই তখন সে স্থানে আসবে এবং তাকে পূর্ণ করবে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তা সম্ভব।

এ কথায় মনে পড়ে গেল একদিন গান্ধীজী মীরাবেনকে বলেছিলেন—"অহিংসা ক্ষমতা দখল করে না। এমনকি ক্ষমতা চায়ও না। ক্ষমতাই তার কাছে আসে।"

গান্ধীজী আরও বললেন—"তা ছাড়া, আমি স্বীকার করি না যে হিংসা ছাড়া সরকার চালানো যেতে পারে না।"

প্যারেলাল॥ রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ধারণা, তার মধ্যেই কি ক্ষমতার ব্যবহার নেই?

গান্ধীজী॥ আছে। কিন্তু ক্ষমতার ব্যবহার হিংসাত্মক হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। পিতা তাঁর সন্তানদের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করেন, এমনকি তিনি শাস্তিও দেন, কিন্তু হিংসা করে নয়। যা সবচেয়ে কম বিরক্তিকর তা-ই ক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট কার্যকরী ব্যবহার। ক্ষমতাকে যদি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা যায় তা হলে তা ফুলের মত হালকা মনে হবে। কেউই তার ওজন অনুভব করতে পারবে না। জনসাধারণ স্বেচ্ছায়

কংগ্রেসের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। একবার নয়, অনেক বারই আমার উপর একনায়কের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকে জানত যে আমার ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়ার উপর। তারা যে কোন সময় আমাকে এক পাশে সরিয়ে দিতে পারত এবং আমিও শব্দটি না করে একপাশে সরে দাঁড়াতাম। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় আমার কর্তৃত্ব অথবা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব কাউকেই বিব্রত করেনি। আলি ভাইরা আমাকে খুবই সমীহ করে চলতেন অথচ তাঁরা জানতেন যে আমি তাঁদের মুঠোর ভিতর। কংগ্রেস বা আমার সম্বন্ধে যা খাটে, সরকার সম্বন্ধেও খাটে তা।

আমি এ সত্য বলে বিশ্বাস করি যে, তত্ত্বগত ভাবে অহিংস রাষ্ট্র, এমনকি অহিংস সংখ্যালঘিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র, যা মুষ্টিমেয় লোকের নৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল—তার অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু এতে ভীষণ আত্মসংযম, আত্মত্যাগ এবং কৃচ্ছ্রসাধন দরকার। ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে অহিংস রাষ্ট্রপতি অথবা অহিংস বিধানকারীর বর্ণনা আছে। তিনি এমন ব্যক্তি যিনি গৃহের সকল বন্ধন কাটিয়েছেন। ভয় অথবা আদর, ক্রোধ অথবা কামনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি যেন বিনয় এবং আত্মবিলুপ্তির জীবন্ত রূপ। অনবরত সংযমের ফলে তিনি তাঁর শরীরকে এমন করেছেন যে সকল সম্ভাব্য আবহাওয়ার কঠোরতা, ক্লান্তি এবং অভাব তা সহ্য করতে পারে।

"কিন্তু ধরুন", লেখক প্রশ্ন করেন,—"প্রাণ ইচ্ছুক, কিন্তু

শরীর দুর্বল। যদি বার্ধক্যের অথবা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে তাঁর শারীরিক গঠন এমন ক্ষয়গ্রস্ত হয় যে তিনি আর অধিককাল কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা সহ্য করতে পারছেন না, তা হলে ?"

সেই কল্পিত প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেওয়া হয় :—"সেই অবস্থায় তিনি চিতায় আরোহণ করুন, যে চিতা তিনি নিজে প্রস্তুত করেছেন। দুর্বল আত্মকরুণা ও পুতুপুতু করা অপেক্ষা বরং সেই চিতায় আত্মবিসর্জন দেওয়া ভাল।"

আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললাম—"ব্যক্তিগত ভাবে আমি স্বীকার করি যে, এ ধরনের লোকই অহিংসার অধীনে একনায়ক হবার যোগ্য। যদি কেউ এ রকম বর্ণনায় ভীত হয়, তিনি যেন রাশিয়াবাসীদের দিকে তাকান। সেখানে বরফজমার ৪০ ডিগ্রারও কম উত্তাপে তারা লড়াই করছে। অহিংসার অধীনে আমরা এর চেয়ে সহজ সমাধান আশা করছি কেন? বরং আরো কঠিনতার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার।"

গান্ধীজী আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন যে, অহিংসা পরিকল্পনায় জনসাধারণকে আরও বেশী আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য অনেক বেশী মহত্তর। চরম লক্ষ্যে পৌঁছুবার কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই।

আমার বোন * বললেন, "তার মানে একজন যীশু খৃষ্ট, মোহাম্মদ অথবা গৌতম বুদ্ধই কেবল অহিংস রাষ্ট্রের শীর্ষাধিপতি হবার যোগ্য ?"

---

* ডাক্তার সুশীলা নায়ার

গান্ধীজী আপত্তি করলেন ঃ "তা ঠিক নয়। অতিমানব ও ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ কোন যুগে একবারই মাত্র জন্মান। কিন্তু এমনকি একজন লোকও যদি অহিংসা আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারেন, তিনি সমস্ত সমাজকে আবৃত ও উদ্ধার করতে পারেন। যীশু একবার আলো জ্বালালেন আর তাঁর বারো জন শিষ্য তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারলেন। বহু বংশাবধি বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা ও তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল বিদ্যুতের নিয়ম আবিষ্কার করার জন্য। কিন্তু আজ প্রত্যেকে এমনকি শিশুরাও তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করছে। ঠিক সেই রকম একটি আদর্শ রাষ্ট্র একবার তৈরী হয়ে গেলে তাকে শাসন করবার জন্য একজন সর্বগুণসম্পন্ন লোকেরই যে সব সময় দরকার তা নয়। যা দরকার তা হল কাজ আরম্ভ করবার জন্য পরিপূর্ণ সামাজিক জাগরণ। বাকী কাজ তার অনুসরণ করবে। হাতের কাছে যে উদাহরণ আছে তা গ্রহণ করবার জন্য আমি শ্রমিক শ্রেণীর কাছে এই সত্য উপস্থিত করছি যে, প্রকৃত সম্পদ রূপা বা সোনা নয়—শ্রমিকের হাত পা ও বুদ্ধিমত্তা। একবার যদি শ্রমিক সে সম্বন্ধে অবহিত হয় তা হলে এর মধ্য দিয়ে যে শক্তি আসবে তা ব্যবহার করবার জন্য আমার উপস্থিতি দরকার হবে না।"

তিান এ কথা বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন যে, আমরা যদি কেবলমাত্র জনসমাজকে তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন

করতে পারি, সে ক্ষমতা অবশ্য অহিংস অসহযোগ, তা হলে অছিবাদ আদর্শের উপলব্ধি আসবেই, যেমন করে রাত্রির শেষে দিন আসে।

[টুওয়ার্ডস্ নিউ হরাইজনস, পৃঃ ৯০-৯৩]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাস্তব অছিবাদের সূত্র

(প্যারেলাল কর্তৃক লিখিত)

জেল থেকে আমাদের মুক্তির পর আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ শিবিরে যেখানে আমরা আলোচনা স্থগিত করেছিলাম, আবার সেখান থেকে প্রশ্ন শুরু করলাম। কিশোরলাল ভাই এবং নরহরিভাই আলোচনায় যোগ দিলেন অছিবাদের একটি সরল, বাস্তব সূত্র প্রস্তুত করবার জন্য। বাপুর কাছে এ সূত্র রাখা হল। তিনি এর কিছুটা পরিবর্তন করলেন। শেষ পর্যন্ত সাবিদা দাঁড়ালো এই রকম :—

১। অছিবাদ বর্তমান সমাজের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাম্যবাদী সমাজে পরিবর্তিত করবার উপায় জুগিয়ে দেয়। ধনতন্ত্রকে এ স্থান দেয় না, অথচ বর্তমান মালিক শ্রেণীকে নিজেদের পরিবর্তিত করবার সুযোগ দেয়। মানব প্রকৃতি শোধনের অতীত কখনোই নয়—এই সত্য অছিবাদের ভিত্তি।

২। যতক্ষণ না সমাজ নিজ কল্যাণের জন্য অনুমতি দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত অছিবাদ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব অস্বীকার করে।

৩। মালিকানা এবং ধনের ব্যবহার আইন করে নিয়ন্ত্রণ অছিবাদের বাইরে নয়।

৪। এ ভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অছিবাদের অধীনে একজন ব্যক্তি নিজের স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তির জন্য তার নিজের অর্থ ইচ্ছামত রাখতে বা ব্যবহার করতে পারবে না। অথবা সমাজের কল্যাণের কথা না ভেবেও তা ব্যবহার করতে পারবে না।

৫। যেমন সুন্দরভাবে জীবন ধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাবার মত একটা পারিশ্রমিক ঠিক করা দরকার, তেমনি সমাজের যে কোন মানুষের সর্বোচ্চ আয়েরও একটা সীমা ঠিক করে দেওয়া দরকার। এ রকম সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের মধ্যে পার্থক্য যুক্তিসংগত, পক্ষপাতশূন্য হওয়া দরকার। এবং তা হবে সময় অনুযায়ী পরিবর্তনশীল, যাতে ঝোঁক থাকে পার্থক্য দূর করার দিকে।

৬। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক বিধি অনুযায়ী উৎপাদনের পদ্ধতি সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্দিষ্ট হবে,—ব্যক্তিগত খেয়াল অথবা লোভের দ্বারা নয়।

[হরিজন, ২৫-১০-'৫২]

—০—